The Chittagong University Journal of Social Sciences Vol. 35, 2026 (P. 245-264)

সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের ক্রমবিকাশ ও উপাদান

ড. মোহাম্মদ নেয়ামত উল্যাহ ভূঁইয়া [১]

***সার–সংক্ষেপ** (Abstract)ঃ সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা। বর্তমানে যেকোনো ভাষার সাহিত্য চর্চায় এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সমাজবিজ্ঞানে 'সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব' নামক শাখাটির উৎপত্তি ঘটেছে। যেকোনো মহৎ সাহিত্যেই সুপ্তভাবে বিদ্যমান থাকে সমাজতাত্ত্বিক নানা উপাদান। সমাজজীবনের যেকোনো সময়ের সামাজিক স্তরবিন্যাস, শ্রেণিবৈশিষ্ট্য, শ্রেণিসংগ্রাম, শোষণ, বঞ্চনা, সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি আমরা সামসময়িক সাহিত্যের আধার থেকে আবিষ্কার করতে পারি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যবেক্ষণ করলে যেকোনো সমাজকে আমরা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি এবং সাহিত্যিকদের মনোভঙ্গি স্পষ্ট বুঝে নিতে পারি। বস্তুত, মার্কস ও এঙ্গেলস-এর বিভিন্ন লেখার সূত্র ধরে সাহিত্য-সমালোচক, ঐতিহাসিক এবং সমাজবিজ্ঞানিগণ সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব বিষয়টির গোড়াপত্তন করেন। অতপর লেনিন, ট্রটস্কি, ক্রিস্টোফার কডওয়েল, র‍্যালফ ফক্স, আর্নস্ট ফিশার, জ্যাঁ পল সার্তে, টেরি ইগলটন প্রমুখ দার্শনিক-সমালোচক-সমাজবিজ্ঞানির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-বিতর্কের মধ্য দিয়ে বিংশ শতাব্দিতে এসে সমাজবিজ্ঞানের এই শাখাটির বিচিত্র বিকাশ ঘটে। মূলত, 'সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের ক্রমবিকাশ ও উপাদান' বিষয়ের এই প্রবন্ধটি দার্শনিক বক্তব্য ও সাহিত্যকর্মভিত্তিক নমুনা বিশ্লেষণের পরিক্রমায় রচিত হয়েছে। সমাজ ও সাহিত্যের সম্পর্কের ক্রম-বিকাশগত পর্যাপ্ত প্রেক্ষাপট ও উপাদান রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে কেবল সমাজতাত্ত্বিক বাস্তবতার সমাজবিজ্ঞানিগণের আদর্শের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে যেসব উপাদান সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে, সেসবের অনুসন্ধানই এর বিবেচ্য হয়েছে এবং বিস্তারিত বিশ্লেষণমূলক আলোচনার মধ্যেই এই প্রবন্ধে এর ক্রমবিকশিত উপাদানসমূহ স্পষ্ট হয়েছে।*

কীওয়ার্ড (Keywords)ঃ মার্কসবাদি-সমাজতাত্ত্বিক, মার্কসবাদি–সাহিত্য, মার্কসবাদি–সাহিত্যিক, শ্রেণিসংগ্রাম, সমাজবাস্তবতা, সমাজবিবর্তন।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান প্রবন্ধে সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও তার ক্রমবিকাশ এবং উপাদান উপস্থাপিত হয়েছে। পূর্বসূরীদের মতভিত্তিক তত্ত্বসমূহ তুলে ধরে সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান ও বিভিন্ন সাহিত্যে প্রতিফলিত দৃষ্টান্তসহ উপাদানসমূহ অনুসন্ধানের চেষ্টা হয়েছে। সাহিত্যের সঙ্গে সমাজতত্ত্বের সম্পর্ক কি; তা এই প্রবন্ধে বিশ্লেষিত হয়েছে। এছাড়াও সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত বিষয়ের মধ্যে কীভাবে যেকোনো সমাজের নানাবিধ সমাজচিত্র, সমাজসংগঠন ও স্তরবিন্যাস, অর্থনৈতিক অবস্থা,

[১] অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম। **ই-মেইল ঃ** lovebangla1952@gmail.com

শ্রেণিবৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবৈষম্য ও শোষণ, বঞ্চনা, জীবন ও জীবিকার উৎস, সামাজিক সমস্যা ও দ্বন্দ্ব, সংঘাত প্রভৃতি ধরা দিতে পারে– তা এই প্রবন্ধের মূল বিষয়। একারণে এই প্রবন্ধটি বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রবন্ধে প্রাথমিক উপাদান হিসেবে সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের উদ্ভবকালীন থেকে ক্রমবিকাশমান তত্ত্বসমূহ এবং বিশ্লেষণের আলোচনায় বিশ্বসাহিত্যের বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম এবং বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম যা সমাজতাত্ত্বিক আদর্শে রচিত হয়েছে, তার ব্যবহার হয়েছে। এজন্যই এর আলোচনার পদ্ধতি বিশ্লেষণমূলক হয়েছে। যেহেতু এটি বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে রচিত প্রবন্ধ; এই বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক উপাদান অনুসন্ধানে সমাজবিজ্ঞানিগণের বিভিন্ন সময়ের সাহিত্য বিষয়ক রচনা, মন্তব্য এবং বিশ্বের সমাজতাত্ত্বিক ধারার বিভিন্ন সাহিত্যিকগণের সাহিত্যকর্মে এর প্রতিফলন নমুনা রয়েছে। মূলত, এসব নমুনা ও মন্তব্য থেকে এর বিশ্লেষণ হয়েছে। এই বিশ্লেষণে এর ক্রমবিকাশ ও উপাদানগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

সমাজ ও সাহিত্যের সম্পর্কের ক্রম-বিকাশগত পর্যাপ্ত প্রেক্ষাপট ও উপাদান রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে কেবল সমাজতাত্ত্বিক বাস্তবতার সমাজবিজ্ঞানিগণের আদর্শের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে যেসব উপাদান সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে, সেসবের অনুসন্ধানই এর বিবেচ্য হয়েছে এবং বিস্তারিত বিশ্লেষণমূলক আলোচনার মধ্যেই এই প্রবন্ধে এর সমাধান মিলেছে। ইতঃপূর্বে আর কোনো গ্রন্থে এমন আলোচনা হয়নি তা বলা যাবে না, তবে যেসব বিক্ষিপ্ত আলোচনা ও গ্রন্থ্ রচিত হয়েছে তা বিষয়গত দিক থেকে পর্যাপ্ত ও সুস্পষ্টরূপে হয়নি। তাই এই ধরনের আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। এর আগে 'মার্কসীয় সাহিত্য সমালোচনার সমস্যা' (গুহ, ১৯৭৫); 'সাহিত্য সন্দর্শন' (ঘোষ, ১৯৭৬); 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে সাম্যচিন্তা' (সেনগুপ্ত, ১৯৮২); 'মার্কসীয় চেতনা ও বাংলা কাব্যের প্রগতিশীল ধারা' (চক্রবর্তী, ১৯৮৩); 'সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞান' (করিম, ১৯৮৩); 'মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যবিচার' (পোদ্দার, ১৯৮৫); 'মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা' (রহমান, ১৯৮৫); 'মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যবিচার' (ইসলাম, ১৯৮৭); 'মার্কসবাদ ও সাহিত্য' (মোকাম্মেল, ১৯৮৯); 'সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব : প্রাথমিক ভাবনা' (ইসলাম, ১৯৯১); 'সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব: প্রসঙ্গ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্য' (সরকার, ১৯৯৩); 'আধুনিক বাংলা কাব্যে সাম্যবাদী চেতনা' (মাহমুদ, ১৯৯৫) সহ প্রমুখের গ্রন্থে এবং নানামাত্রিক রচনায় মার্কসবাদী বিষয়গুলোর বিভিন্ন আলোচনাসূত্রে বিক্ষিপ্তভাবে সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব ও উপাদান তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধটি নানা কারণে এসব আলোচনা থেকে ভিন্ন, কারণ এই প্রবন্ধে সমাজতত্ত্ব ও

সমাজবিজ্ঞানিদের তাত্ত্বিক ভাবনার প্রতিফলিত সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে উপাদান চিহ্নিতকরণ ও সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের ক্রমবিকাশকে স্পষ্ট হয়েছে।

আদিম কাল থেকেই সামাজিক প্রয়োজনে মানুষ সাহিত্যের চর্চা করে আসছে। শিকার-যুগে যৌথ-শক্তির উদ্বোধনে অপরিহার্য ছিল সমন্বিত উদ্যোগ ও আবেগের, এবং তারই অনুষঙ্গী হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল আদিম কাব্য-গীতি ও গোষ্ঠী-সঙ্গীত। গুহাবাসী মানুষ প্রাণধারণের প্রয়োজনে যে সঙ্গীত সৃষ্টি করেছিল, তা ছিল তখনকার জীবনের অঙ্গীভূত, সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা স্বতন্ত্র সত্তা লাভ করে উপরি-কাঠামোয় পরিণত হয়। সমাজ ও জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নিরবধি কাল ধরেই থেকে গেছে অচ্ছেদ্য।

আদিম কাল থেকেই সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের এই মৌলিক সম্পর্ক সভ্যতার বিবর্তনে রূপান্তরিত হয়েছে, তবে তার কেন্দ্রীয় প্রত্যয়টি থেকে গেছে অবিকৃত। সমাজের অনুপ্রেরণায় লেখক সাহিত্য নির্মাণ করেন। চিত্তবিনোদনের জন্য সাহিত্য-সৃষ্টি–সমাজবিজ্ঞানীর কাছে এ-কথা বেশী গ্রহণযোগ্য নয়। সমাজের শৈল্পিক প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যে, যা সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বিকাশ বিবর্তনকে শিল্পরূপ প্রদান করে।

আত্মপ্রকাশের বাসনা, সমাজ-সত্তার সঙ্গে সংযোগ কামনা, অভিজ্ঞতার আলোয় কল্পলোক নির্মাণ এবং রূপপ্রিয়তা– এই চতুর্মাত্রিক প্রবণতাই মানুষের সাহিত্য-সাধনার মৌল উৎস (দাস, ১৯৭৬)। উপর্যুক্ত চতুর্মাত্রিক প্রবণতার মধ্যে 'সমাজসত্তার সঙ্গে সংযোগ-কামনা' এবং 'অভিজ্ঞতার আলোয় কল্পলোক নির্মাণ'–এই উৎসদ্বয়ের মধ্যে নিহিত রয়েছে সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে আন্তর-সম্পর্কের প্রাণ-বীজ। সাহিত্য সমাজবিচ্ছিন্ন বৃন্তলীন কোনো কুসুম নয় এবং সাহিত্যিকও নন সমাজ-বহির্ভূত আলৌকিক জগতের কোনো কল্প-মানুষ। সমাজের সঙ্গে তাঁর বন্ধন শাশ্বত এবং তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্মে সামাজিক অভিজ্ঞতার আলোকেই নির্মাণ করেন এক নতুন বাস্তবতা, যে-বাস্তবতা সমাজ-অভিজ্ঞতারই শৈল্পিক ব্যঞ্জনা মাত্র।

সমাজসংগঠন-সৃষ্ট শ্রেণিকাঠামো ও শ্রেণি-মনস্তত্ত্ব সাহিত্যে রূপ লাভ করে এবং এ-সূত্রেই সমাজকাঠামোর সঙ্গে সাহিত্যের গভীরতর সম্পর্ক ধরা পড়ে। বস্তুত, সমাজ-বিকাশের প্রবহমান ধারার আলোকেই সাহিত্যের স্বরূপ সন্ধান করা উচিত। সাহিত্যের আধারেই সুপ্তাবস্থায় বিরাজ করে সমাজবিকাশের মৌল প্রবণতাসমূহ। সাহিত্যিক তাঁর রচনায় বিশেষ কোনো মতাদর্শ বা নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক-সামাজিক সমাধান যদি না-ও বা দেন, তবু বাস্তব সামাজিক জীবন-রূপায়ণের জন্যে তাঁর সৃষ্টিকর্ম সমাজবিজ্ঞানির কাছে বিবেচিত হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ কোনো গবেষণার উপাত্ত-উপাদানের উৎস হিসেবে।

গবেষণার ফলাফল

মানুষ সামাজিক নানান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় উত্তীর্ণ হওয়া সামাজিক জীব এবং সাহিত্য হলো এসবের দর্পণ বা প্রতিবিম্ব। সামাজিক ঘটনা বা সমস্যাবলি সাহিত্যিকের মনে কেবল

অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে না, বা তিনি তা কেবল প্রকাশই করেন না; বরং সমাজের যে সামগ্রিক উত্থান-পতন হচ্ছে এবং যে-সব শক্তি ঐ উত্থান-পতনে সহায়তা করছে, সাহিত্যিক সে-সবকে শৈল্পিক উপায়ে জনসমক্ষে উন্মোচিত করেন। বস্তুত, সাহিত্যের সমাজতত্ত্বে সমাজবিজ্ঞানির কাছে এটিই হওয়া উচিত কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি। সামাজিক পরিবর্তন ও বিকাশের ধারা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকলেই সাহিত্যিকের পক্ষে মহৎ কোনো শিল্পকর্ম নির্মাণ করা সম্ভব।

তবু এ-রকম একটি সাধারণ ধারণা প্রচলিত যে, সাহিত্যিকরা হচ্ছেন প্রবলভাবে ভাবপ্রবণ এবং এই ভাবের উৎস হচ্ছে তাঁর অন্তরলোক, অলৌকিক প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন বলেই তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু কোনো সমাজবিজ্ঞানিই এ-ধরনের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেন না। ব্যক্তির স্বতন্ত্র প্রতিভার কথা অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু কবিচিত্তে ভাব-সৃষ্টিতে সামাজিক পটভূমি ও সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ নির্ধারণ করাই সমাজবিজ্ঞানির কাছে মুখ্য বিবেচ্য বিষয়। বস্তুত, সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য থেকেই জন্ম নেয় ভাবরাজি এবং কবিচিত্ত স্বাভাবিকভাবে সংবেদনশীল ও অনুভূতিপ্রবণ বলেই তাঁর কাছে তা বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়। সে উদ্ভাসনে যখন দেখা যায়, সমাজজীবনের যেকোনো সময়ের সামাজিক স্তরবিন্যাস, শ্রেণিবৈশিষ্ট্য, শ্রেণিসংগ্রাম, শোষণ, বঞ্চনা, সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি আমরা সামসময়িক সাহিত্যের আধার থেকে বুঝে নিতে পারি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যবেক্ষণ করলে যেকোনো সমাজকে আমরা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি এবং সাহিত্যিকদের মনোভঙ্গিও স্পষ্ট বুঝে নিতে পারি।

তাই, আমাদের দৃষ্টিতে মনে হয়েছে, সমাজ ও সাহিত্যের সম্পর্কের ক্রম-বিকাশগত পর্যাপ্ত প্রেক্ষাপট ও নানান উপাদান রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে কেবল সমাজতাত্ত্বিক বাস্তবতার সমাজবিজ্ঞানিগণের আদর্শের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে যেসব উপাদান সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে, সেসবকে এখানকার বিশ্লেষণমূলক আলোচনার ফলাফল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানি–সাহিত্যিক, সমাজ-সাহিত্যের সম্পর্ক ও উপাদান প্রতিফলন ভূমিকা

সাহিত্যিক ও সমাজবিজ্ঞানি উভয়েই সামাজিক জীব ও প্রকারান্তরে এই পৃথিবীর মাটি দিয়ে গড়া মানুষ। সাহিত্য হলো সাহিত্যিকের মনের রসায়নে সৃষ্ট শিল্পকর্ম। অপরদিকে সমাজ হলো দলবদ্ধ মানুষের যাপিত জীবন। এই যাপিত জীবন নিয়ে সাহিত্যিকের সাহিত্য সৃষ্টির পশ্চাতে সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকে বিশেষ কোনো সামাজিক প্রয়োজন। বস্তুত, সমাজবিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মানুষের নিরন্তর শ্রেণি-সংগ্রামের প্রয়োজনই সাহিত্যিককে তার সৃষ্টিকর্মে উদ্বুদ্ধ করে। শ্রেণিসংগ্রামের প্রক্রিয়া সাহিত্যে উপস্থাপিত হয় বলেই তা আকৃষ্ট করে সমাজবিজ্ঞানিকে। যে সাহিত্যে সামাজিক ক্রিয়াকলাপ বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত হয়, সেই

সাহিত্যই সমাজবিজ্ঞানির জন্য প্রয়োজনীয় হয়। সমাজ সম্পর্কে সচেতন নয় এমন সাহিত্যিকের রচনা সমাজবিজ্ঞানির কাছে মূল্যহীন। মূলত সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্ক বাস্তব এবং চিরন্তন। তাই মানবিক সাহিত্যিককে তাঁর সমকালীন সমাজ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। সুতরাং সাহিত্যানুশীলন অবশ্যই একটি সামাজিককর্ম। সময়ের পরিক্রমায় সমাজ প্রতিবেশই অলক্ষ্যে নির্ধারণ করে দেয় সেই সমাজের সাহিত্যের মৌলিক প্রবণতা। সাহিত্যের বিষয়, আঙ্গিক ও উপাদান একান্তভাবেই সমাজ বিকাশের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। সাহিত্যের পাতায় উঠে আসে নির্দিষ্ট কোনো কালের বৈশিষ্ট্য, বিশেষ কোনো সমাজের বাস্তবচিত্র। সামাজিক দায়বদ্ধ মানুষ হিসেবে সাহিত্যিকগণ নিজস্ব চেতনায় সাহিত্য রচনা করেন। তখন ঐ সাহিত্যিকের মানসলোক একটি বিশেষ সমাজ কাঠামোর বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত হয়। এভাবে বিকশিত হয় সাহিত্যিকের জীবনবোধ ও জীবনচেতনা। সুতরাং এটিই স্বাভাবিক যে, সমাজসচেতন সাহিত্যিকের রচনায় ঐ বিশেষ সমাজের প্রতিফলন ঘটবে। যেকোনো মহৎ সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত হয় বিশেষ কোনো সমাজ সংগঠনের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিচয় ও শ্রেণিসংগ্রামের বাস্তব ইতিহাস। দৃষ্টান্ত হিসেবে অনেক মহৎ সাহিত্যকর্মের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন: রুশ বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা'(১৯০৭) উপন্যাস; বাংলা সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সাম্য' প্রবন্ধ; বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণকাহিনি 'রাশিয়ার চিঠি'(১৯৩১) এবং নাটক 'রক্তকরবী'(১৯২৬); বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'সাম্যবাদী'(১৯২৫), 'সর্বহারা'(১৯২৬) ও 'নতুন চাঁদ'(১৯৪৫); বিষ্ণু দে'র 'উর্বশী ও আর্টেমিস'(১৯৩৩) কাব্য; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম 'পদ্মানদীর মাঝি'(১৯৩৬) উপন্যাস; সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক'(১৯৪০) কাব্য; সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র'(১৯৪৭) এবং 'পূর্বাভাষ(১৯৫০) কাব্য; আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ী'(১৯৫৫), 'হারেম'(১৯৬২), 'মহাপতঙ্গ'(১৯৬৩) এবং বিখ্যাত 'জোঁক' গল্প; আলাউদ্দিন আল–আজাদের 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র'(১৯৬০), 'ক্ষুধা ও আশা'(১৯৬৪); শওকত ওসমানের 'মনিব ও তাহার কুকুর'(১৯৮৬) গল্পগ্রন্থ; নির্মলেন্দু গুণের 'তার আগে চাই সমাজতন্ত্র'(১৯৭৯) ও 'নিরঞ্জনের পৃথিবী'(১৯৮৬) নামক কাব্য; আল মাহমুদের বিখ্যাত কাব্য 'সোনালি কাবিন'(১৯৭৩); রফিক আজাদের 'চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া'(১৯৯৭) কাব্য এবং 'ভাত দে হারামজাদা' নামক কবিতাসহ অনেক মহৎ সাহিত্যকর্মে এর প্রমাণ রয়েছে। তাই একজন সমাজতাত্ত্বিক মনোযোগ সহকারে বিশেষ কোনো যুগের সাহিত্যকর্ম বা বিশেষ কোনো ভাষার ধারাবাহিক সাহিত্যকর্ম অনুসন্ধান করলে ঐ যুগের বা দেশের সমাজ, তার সংগঠন ও স্তরবিন্যাস, অর্থনৈতিক অবস্থা, শ্রেণিবৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবৈষম্য ও শোষণ, বঞ্চনা, জীবন ও জীবিকার উৎস, সামাজিক সমস্যা ও দ্বন্দ্ব, সংঘাত প্রভৃতি মাকসবাদি–সাহিত্যিক উপাদান আবিষ্কার করে নিতে পারেন। এই প্রবন্ধে বিভিন্ন মার্কসবাদি সমাজবিজ্ঞানির বাস্তব সমাজদর্শন ও মার্কসবাদি

ধারার সাহিত্যিকগণের রচিত সাহিত্যের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে, যা অব্যাহতভাবে সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের বিকাশকে তরান্বিত করে চলেছে।

সমাজ–সাহিত্যের পারস্পরিকতা ও সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের আঙ্গিক উপাদান নির্ভরতার ধরন

সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কারণে সমাজবিজ্ঞানিরা সাহিত্যকে জীবনধারণের অন্যতম উপকরণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সমাজবিজ্ঞানি কেনেথ বার্ক-এর অভিমত এ-প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। তাঁর মতে– "Literature is the equipment of living" (Burke, 1973)। বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আঙ্গিক এবং প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যও সমাজ-সংগঠনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বিকশিত এবং রূপান্তরিত হয়। সমাজ সংগঠনের গুণগত পরিবর্তন কিংবা নতুন শ্রেণিবিন্যাসের প্রভাবে সাহিত্যে দেখা দেয় নতুন নতুন আঙ্গিক। বস্তুত, সাহিত্যের ভাষা ও আঙ্গিক, তার বিষয়বস্তুর মতই সমাজের মূল থেকে উদ্ভূত হয়। সাহিত্যের ভাষা ও আঙ্গিক যে আকস্মিক নয়, কিংবা সমাজনিরপেক্ষও নয়, সে-সম্পর্কে সাহিত্যের সমাজবিজ্ঞানি দীপ্তিকুমার বিশ্বাস-এর অভিমতও উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে- "The style in literature is also a social product" (Biswas, 1974). বুর্জোয়া সমাজে আমরা উপন্যাসের উপস্থিতি লক্ষ করি। বস্তুত, বুর্জোয়া বিকাশই জীবনের সমগ্রতাস্পর্শী সাহিত্য-রূপকল্প উপন্যাসের জন্ম-সম্ভাবনাকে সম্ভব করে তুলেছিল। বুর্জোয়া সমাজের উদার মানবতাবাদ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যচেতনা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ উপন্যাসের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে। পুঁজিবাদী সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সঙ্কট থেকে জন্ম নিয়েছে অ্যাবসার্ড নাটক। মধ্যযুগীয় সামন্ত-সমাজের সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে আছে আখ্যানধর্মী বা রোম্যান্সমূলক কাব্য– প্রাচীন সভ্যতার যুগে অপরিসীম সাধনায় রূপ লাভ করেছে রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডেসি প্রভৃতি মহাকাব্য। সামন্তবাদ থেকে ধনতন্ত্রে রূপান্তরের পর্যায়ে গদ্য, গীতিকবিতা ও কথাসাহিত্যের বিকাশ ঘটে (রহমান, ১৯৮৫)। কেবল আঙ্গিক নয়, ভাষার ক্ষেত্রেও সামাজিক রূপান্তরের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়।

সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের উৎপত্তিকালীন উপাদানচিন্তা ও সাহিত্যকর্মে প্রতিফলন

মার্কস, গোর্কি, লেনিন, এঙ্গেলস, প্লেখানভ প্রমুখ দার্শনিক-সাহিত্যিকের বিভিন্ন লেখার সূত্র ধরে সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক ধারণার উদ্ভব। মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের উদ্ভবের পর থেকেই সমাজবিজ্ঞানে 'সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব' শাখাটি একাডেমিক পর্যায়ে বিকশিত হতে শুরু করে। মার্কস বা এঙ্গেলস কেউই সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। তবে, পূর্ণাঙ্গ কোনো গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনা না করলেও মার্কস এবং এঙ্গেলসের বিভিন্ন গ্রন্থে সাহিত্য সম্পর্কে প্রচুর অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। এছাড়াও অনেক প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও পুস্তিকায় সাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এসব গ্রন্থে

সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মৌলিক ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন অনেক বক্তব্য পাওয়া যায়। মূলত, সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলসের সকল বক্তব্য তাঁদের 'On Literature and Art' (1976) শীর্ষক গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক, সাহিত্যের উদ্দেশ্য-প্রবণতা, ধনতান্ত্রিক যুগে সাহিত্যের লক্ষণ ও বস্তুগত উপাদান, সাহিত্যের আঙ্গিক ইত্যাদি প্রশ্নে তাঁদের বক্তব্য উল্লিখিত গ্রন্থে একত্রে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে, সেখানে ঐ যুগের বা দেশের সমাজ, তার সংগঠন ও স্তরবিন্যাস, অর্থনৈতিক অবস্থা, শ্রেণিবৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবৈষম্য ও শোষণ, বঞ্চনা, জীবন ও জীবিকার উৎস, সামাজিক সমস্যা ও দ্বন্দ্ব, সংঘাত প্রভৃতি বিষয়ে নানা বক্তব্য বিধৃত হয়েছে। এসব বিষয়ই সমকালের সাহিত্যিকগণ তাদের সাহিত্যের উপজীব্য করেছেন।

(ক) কার্ল মার্কস এর সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য উপাদানচিন্তা

মার্কস সমস্ত কাল্পনিকতা বর্জন করে দার্শনিক ভিত্তির উপর তার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইতিহাস ও অর্থনীতির আলোকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের পথনির্দেশ করেন। মার্কস দেখালেন যে, ধনতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী শ্রমিকশ্রেণির অভ্যুদয় অনিবার্য এবং এর ফলে সমাজের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য অবশ্যম্ভাবীরূপে সঞ্জাত হচ্ছে, তার পরিণতি হলো সামাজিক বিপ্লব। এছাড়াও মার্কসীয় দার্শনিক ভিত্তির অন্য উপাদানগুলো হলো: দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ, শ্রেণিসংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সর্বহারার একনায়কত্ব, সাম্যবাদে উত্তরণ ও রাষ্ট্রের বিলুপ্তি; ইত্যাদি। কার্ল মার্কসের সমাজ, রাষ্ট্র ও দার্শনিকতত্ত্বের উপর নির্ভর করে মার্কসীয় সাহিত্য–বিচার পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে। মার্কসীয় সাহিত্যের অন্যতম প্রসঙ্গ হচ্ছে বাস্তবতার প্রতিফলন। ম্যাক্সিম গোর্কি মার্কসের এই বাস্তববাদকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ নামে অভিহিত করেছেন এবং তাঁর 'মা'(১৯০৭) উপন্যাসে তার প্রয়োগ করে সফলও হয়েছেন।

মার্কস সাহিত্যকে সামাজিক চেতনারই একটি প্রতিরূপ বলে মনে করেছেন। তাঁর ভাষায়– "Art is a form of social consciousness." (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮৪)। সামগ্রিক বিশ্ববীক্ষার আলোকেই তিনি সাহিত্যকে বিবেচনা করেছেন। বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক অরবিন্দ পোদ্দার যথার্থই বলেছেন– "সাহিত্যের বিশ্লেষণেও মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের দ্বান্দ্বিক মূলসূত্র, দার্শনিক প্রত্যয় ও আদর্শ কখনও বর্জন করেনি" (পোদ্দার, ১৯৮৫)। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের বাস্তবতাই যে সাহিত্যসৃষ্টির পশ্চাতে সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকে, সে-কথা মার্কসই প্রথম ব্যাখ্যা করেন।

সুতরাং মার্কসের উক্ত প্রসঙ্গে ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' (১৯০৭) উপন্যাস এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাস সাহিত্যে বাস্তবতা নির্মাণের আদর্শ নমুনা হতে পারে।

ম্যাক্সিম গোর্কির ‘মা’ (১৯০৭) উপন্যাসে রাশিয়ার তৎকালীন সমাজবাস্তবতা ও রাষ্ট্রিক বাস্তবতা এবং ফলাফল স্বরূপ ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব। ‘মা’ উপনাস্যাসের মা ও পাভেল শেষপর্যন্ত বাস্তবতার প্রতিভূ হয়েছেন, আরও হয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের শোষণ-বঞ্চনা-পীড়িত মানুষের বাস্তব আদর্শ। ‘মা’ উপন্যাসের নায়ক পাভেল ভ্লাসভ হয়ে উঠেছে মার্কসের আদর্শের নবযুগের নায়ক।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম ‘পদ্মানদীর মাঝি’ (১৯৩৬) উপন্যাসে নিম্নশ্রেণির জেলে-মাঝি ও পদ্মানদীর তীরবর্তী কেতুপুর গ্রামের দরিদ্র মানুষের সংগ্রামী জীবন হয়ে উঠেছে বাংলার আঞ্চলিক জীবনের সমাজবাস্তবতা ও শ্রেণিসংগ্রামের ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পরাজিত মানবাত্মার বাস্তব-রূঢ় বৈশ্বিক দলিল। যদিও হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপ তাদের স্বপ্ন ও আশাকে একত্রে নিহত করছে। তারপরও শেষপর্যন্ত নায়ক কুবেরের বাস্তব ও মনোগত সংগ্রাম এবং কুবেরের কাছে কপিলার অসহায় আত্মসমর্পণ, এই উপন্যাসের শ্রেণিগত সংগ্রামকে দিয়েছে নতুন পথের সন্ধান। এখানে কুবেরের বাস্তবতার কাছে পরাজিত হয়েছে বৃহত্তর মানবসমাজ।

অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং মানসিক উপরিকাঠামোর মধ্যে সম্পর্কের স্বরূপ-সন্ধানই মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের মৌল বিষয়। মার্কসের মতে, সমাজের উৎপাদন-প্রক্রিয়াই সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে। মানুষের চেতনা তার অস্তিত্বকে নির্ধারণ করে না, বরং উল্টোভাবে মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনালোককে নির্ধারণ করে।

মার্কসের এই প্রসঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মার্কসবাদি সমাজ ও রাজনীতির দলিল‘ পদাতিক’ (১৯৪০) কাব্য আদর্শ নমুনা হতে পারে। মার্কসীয় রাজনৈতিক প্রত্যয়ই ‘পদাতিক’ কাব্যগ্রন্থে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিমানসের মূল ভিত্তি ও প্রেরণা। গণমুখী রাজনৈতিক চেতনার উষ্ণতার সঞ্চারিত হয়েছে এর প্রায় প্রতিটি কবিতায়। ১৯৩০ এর দশকে একদিকে ফ্যাসিবাদের উত্থান ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সৃষ্ট বৈনাশিক সংকট, অন্যদিকে মেহনতি মানুষের বিপ্লবী সংগ্রামের মাধ্যমে সাম্য-মৈত্রীময় নতুন পৃথিবী রচনার প্রত্যাশা– সমকালীন এই বাস্তবতার চমকপ্রদ ও অভিনব কাব্যিক রূপ-নির্মিতি ঘটেছে এই ‘পদাতিক’ কাব্যে। বিশ্বময় দুর্যোগ ও সংকটকে মোকাবেলা করে তা উত্তরণের বলিষ্ঠ অঙ্গীকারের মাধ্যমে মূর্ত হয়েছে মার্কসবাদে দীক্ষিত দায়বদ্ধ কবির অবস্থান ও ভূমিকা। এই কাব্যে জনসংলগ্নতা ও জনমুক্তির রাজনৈতিক চেতনাই শেষপর্যন্ত জয়ী হয়। সমকালীন সংকট উত্তরণে মার্কসীয় সাম্যবাদ যে সম্ভাব্য প্রত্যাশার আলো ছড়িয়ে গিয়েছিলো, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘পদাতিক’ কবিতাগুলোই এর প্রমাণ; আর এই সুভাষ উঠে এসেছিলেন মার্কসবাদের বাস্তবতা থেকেই। তাঁর দীপ্ত উচ্চরণ–“কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?”

(সকলের গান, পদাতিক)। কিংবা, একই কবিতায় আরো প্রত্যয়দীপ্ত উচ্চারণ– "আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি।"

সার্থক সাহিত্য সমাজের সৃজনশীল প্রক্রিয়া তথা শ্রমের সঙ্গে যে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত, মার্কস তা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। যেহেতু সমাজের মূল সৃজনশীল প্রক্রিয়া হচ্ছে অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং এই প্রক্রিয়া যেহেতু অন্য সকল প্রকার সামাজিক সৃষ্টির ভিত্তি, সেহেতু সামগ্রিকভাবে সাহিত্য অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থার অধীন (উমর, ১৯৮৬)। এই ধারণার সূত্রেই মার্কসের সাহিত্যতত্ত্বে এসেছে মৌলকাঠামো ও উপরিকাঠামোর মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।

উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদন-সম্পর্ক এ-দুইয়ের সমন্বয়ে গঠিত হয় মৌলকাঠামো। এই মৌলকাঠামোই উপরিকাঠামোকে নির্মাণ করে। উপরিকাঠামোর অন্তর্গত বিষয়সমূহ হচ্ছে রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, সংস্কৃতি ইত্যাদি। উপরিকাঠামোর সবগুলো উপাদানের সঙ্গেই রয়েছে সাহিত্যের সম্পর্ক, যেমন রয়েছে মৌলকাঠামোর সঙ্গে। মার্কসের মতে, মৌলকাঠামো পরিবর্তিত হলে উপরিকাঠামোর রূপান্তর ঘটে এবং একই কারণে সাহিত্যের বিষয় ও প্রকরণে পরিবর্তন ঘটে। বস্তুত, ইতিহাসের ব্যাখ্যাকেই মার্কস সাহিত্য- সমালোচনার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সাহিত্যে বাস্তবতার নির্ভরযোগ্য রূপায়ণের প্রতি তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর বিবেচনায় সমাজ-বাস্তবতার যথাযথ রূপাঙ্কনই সাহিত্যের প্রধান কাজ।

মার্কসের এসব প্রসঙ্গে সুকান্ত ভট্টাচার্যের বৃহৎ মানব সমাজ নির্মাণের দলিল 'ছাড়পত্র' (১৯৪৭) কাব্য আদর্শ নমুনা হতে পারে। শ্রেণিচেতনা থেকে শ্রেণিসংগ্রামে উত্তরণ সুকান্ত ভট্টাচার্যের অন্যতম কবি বৈশিষ্ট্য। এক শ্রেণির উপর অন্য শ্রেণির আধিপত্য বা শোষণ-নিষ্পেষণ চাপিয়ে দেওয়ার চিত্র অঙ্কন করে কিংবা বৈষম্যের অবস্থা প্রদর্শন করেই তিনি লেখনী স্তব্ধ করেননি, শ্রমজীবীদের সংগ্রামী মন্ত্রদান, দাসত্ব থেকে মুক্তির মন্ত্র, শোষণ যন্ত্রণার নিরসনে বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্বলন করার বিষয়টি সুকান্ত ভট্টাচার্য মার্কসবাদের বাস্তবতা থেকেই শিখেছিলেন। এজন্য কাব্যিক কাঠামো এবং বিষয়গত বাস্তবতার রূপায়ন সবই সুকান্তের কবিতায় ছিলো। স্বদেশ ভাবনা, সমকালীন সমাজভাবনা এবং কবিতার বিষয় ও প্রকরণেরও সুকান্ত ভট্টাচার্যের মতো কেউই নেই। তিনি তীব্রভাবে মার্কসবাদের সকল উপকরণের চর্চা তাঁর সাহিত্য সাধনায় দেখিয়ে গেছেন। মার্কসের শ্রেণি চেতনার দীপ্ত রানার হলেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁর দীপ্ত উচ্চারণ পৃথিবীকে কম্পন ধরিয়ে দেয়– "কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি/ ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী–গদ্যময়;/ পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি"(হে মহাজীবন, ছাড়পত্র)। কিংবা, "চলে যাব– আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ/ প্রাণপনে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,/ এই বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি–/ নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার" (ছাড়পত্র, ছাড়পত্র)।

বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আঙ্গিক সম্পর্কেও মার্কস চিন্তাভাবনা করেছেন। তাঁর মতে, সমাজে নতুন শ্রেণিবিন্যাসের ফলেই সাহিত্যে দেখা দেয় নতুন আঙ্গিক, নতুন প্রকরণ। মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বে সাহিত্যকর্মের আঙ্গিক, শৈলী ও অর্থকে একটি নির্দিষ্ট ইতিহাসের ফল হিসেবেই ব্যাখ্যা করা হয়।

(খ) ম্যাক্সিম গোর্কি'র সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য উপাদানচিন্তা

গোর্কি সমাজ জীবনকেই মুক্তি লাভের পথ ভেবেছেন। লেলিনের এই ভাবশিষ্য তাই ইতিহাস থেকে পাঠ নিয়েছেন। তিনি দেখেছেন যে, ইতিহাস দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে অগ্রায়মান। বিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় এক বিরাট ফাটল ধরেছে। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে সেই সমাজ ব্যবস্থা তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়বে এর স্থানে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে– সেখানে মানুষ মানুষের আত্মাকে পিষে মারতে পারে না। এই কারণে ম্যাক্সিম গোর্কিও সাহিত্যের সামাজিক উপযোগিতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। ১৯১৭ সালে সংঘটিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার সামাজিক বাস্তবতার বিশাল ক্যানভাস নিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'মা' (১৯০৫)। বস্তুত, গোর্কির সাহিত্যতত্ত্বের স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে উক্ত উপন্যাসে। তৎকালীন সামাজিক বাস্তবতাকে প্রকাশ করবার জন্যই তিনি এ-উপন্যাসটি লিখেছেন। এই উপন্যাসে মা নিলভনার কথাই যেনো ম্যাক্সিম গোর্কি'র কথা। বিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় এই মা উচ্চারণ করেছে– "আমার পুনরুজ্জীবিত আত্মাকে মারতে পারবে না ওরা" (মা, গোর্কি)। শুধু মা নয়, মা'র আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অসংখ্য অগণিত বিপ্লবী এক নতুন সমাজ গঠনের জন্য আত্মাহুতি দিয়েছে।

(গ) লেনিন এর সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য উপাদানচিন্তা

লেনিন বিপ্লবের সংগঠক হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্য সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করেছেন। তিনি সাহিত্যকে সমাজ-বাস্তবতার প্রকৃত প্রতিচ্ছবি ও জীবন-উপলব্ধির অন্যতম মাধ্যমে রূপে বিবেচনা করেন। যে-সাহিত্যে সমাজ-বিবর্তনের উপাদান বিদ্যমান, যাতে রয়েছে তার সার্থক রূপায়ণ, সে-সাহিত্যকেই তিনি মহৎ সাহিত্য বলে গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও লেনিন সাহিত্যের উপযোগিতার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি মনে করেন, সাহিত্য তার বিভিন্ন কালপর্বে মানুষের দুঃখ-বেদনা ও আশা-নিরাশাকে প্রতিফলিত করছে এবং সমাজ-বিবর্তনের রেখে আসছে উপযোগিতার স্বাক্ষর। সাহিত্যকে তিনি জনগণের সম্পদ বলে মনে করতেন। তবে সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব প্রসঙ্গে মার্কসের সঙ্গে লেনিনের পার্থক্য হলো মার্কস সামাজিক উপযোগিতার কথা বলেও সাহিত্যের নান্দনিক দিকের প্রতি সীমিত মনোযোগ দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু লেনিন সাহিত্যকে পার্টির আদর্শ বাস্তবায়নের হাতিয়ার রূপে দেখেছেন।

> Literature must become part of the common cause of the proletariat, "a cog and a screw" of one single great Social-Democratic mechanism

> set in motion by the entire politically-conscious vanguard of the entire working class. Literature must become a component of organised, planned and integrated Social-Democratic party work (Lenin. op. cit., note 46).

(ঘ) এঙ্গেলস এর সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য উপাদানচিন্তা

মানবিকতা ও জীবনের সজীব রূপায়ন– সাহিত্যে এই দুইটি গুণের খুবই সমাদর করতেন মার্কস এবং এঙ্গেলস। মার্কসের মতোই এঙ্গেলসও মনে করতেন, মানুষের আত্মোপলব্ধি ও সমাজ-রূপান্তর প্রক্রিয়ায় এক অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে সাহিত্যকর্ম। এঙ্গেলস-এর মতে, সাহিত্য বাস্তবের এক বিশেষ অভিপ্রকাশ। তিনি সাহিত্য নির্মাণের জন্য যে শ্রমের প্রয়োজন হয়, তাকে উন্নত ধরনের শ্রম বলেছেন। তাঁর বিবেচনায় মানব-সভ্যতার ইতিহাসে সাহিত্য অশেষ ভূমিকা পালন করে এসেছে এবং সামাজিক সম্পর্ককেও করেছে প্রভাবিত। সাহিত্যে বাস্তবতার নির্ভরযোগ্য রূপায়ণের প্রতি এঙ্গেলস সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

এঙ্গেলস এর এই প্রসঙ্গের সঙ্গে বিদ্রোহী কাণ্ডারী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর 'অগ্নি-বীণা'(১৯২২), 'সাম্যবাদী'(১৯২৫), 'সর্বহারা'(১৯২৬) ও 'নতুন চাঁদ'(১৯৪৫) কাব্য সাহিত্যকর্মের আদর্শ নমুনা হতে পারে। মার্কসীয় সাম্যবাদের প্রত্যয়দীপ্তে কবি ছিলেন বিদ্রোহী এবং মানবিক। এছাড়া নবযুগ, ধুমকেতু, লাঙ্গল, গণবাণী প্রভৃতি পত্রিকায় তার লেখনী কৃষক–শ্রমিকের মুক্তির লক্ষেই সোচ্চার ও মানবিক ছিলেন এবং জীবনের সজীব রূপায়ন তাঁর সাহিত্যে অঙ্কন করে গেছেন। "ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন"(আমার কৈফিয়ত, সর্বহারা)। কিংবা "তুমি শুয়ে রবে তেতালার পরে আমরা রহিব নীচে,/অথচ তোমারে দেবতা বলিব সে ভরসা আজ মিছে "(কুলি-মজুর, সাম্যবাদী)। সুতরাং নজরুলের কাব্য উপজীব্যে যেমন মার্কসীয় চেতনার সংক্রম তেমনি সুস্পষ্টরূপে রয়েছে এঙ্গেলস এর জীবনের সজীব রূপায়ন চেতনার প্রচ্ছাপ। তাঁর কাব্য প্রকরণেও এর প্রমাণ রয়েছে।

এছাড়াও এঙ্গেলস বিষয়ের মতো সাহিত্যের আঙ্গিকের প্রতিও লেখককে সতর্ক থাকতে বলেছেন। সমাজকাঠামোর স্থূল চিত্রকে তিনি সাহিত্য বলে মনে করতেন না। সাহিত্যের বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের মধ্যে যে গভীরতর যোগসূত্র থাকে, তার প্রতি এঙ্গেলস সুনির্দিষ্টভাবে ইঙ্গিত করেছেন।

(ঙ) জি. ডি. প্লেখানভ এর সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য উপাদানচিন্তা

মার্কস-এঙ্গেলসের মতো তিনিও মনে করতেন একটি বিশেষ যুগের সামাজিক মানসিকতা সে-যুগের সাহিত্যেই সুস্পষ্টভাবে মুদ্রিত থাকে। সামাজিক-মানসিকতা ও সামাজিক সম্পর্ক সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। তিনি সাহিত্যের সামাজিক ভূমিকাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার

পক্ষপাতী ছিলেন। তবে তাঁর কাছে সাহিত্যের সামাজিক ভূমিকাই বেশী তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। তিনি মনে করতেন 'সাহিত্য হচ্ছে সমাজ জীবনের দর্পণ'। প্লেখানভ সাহিত্যের বিষয়কে শৈল্পিক ভাষা-মাধ্যম থেকে রূপান্তরিত করে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ করার পরামর্শ দিয়েছেন (Arvon, 1973)। তিনি মনে করেন, লেখক তাঁর সাহিত্যকর্মে সামাজিক তথ্যসমূহকেই নতুন রূপ দান করেন এবং সমালোচকের দায়িত্ব হচ্ছে সেই সব সামাজিক তথ্যকেই লেখা থেকে নিষ্কাশন করে নিয়ে তার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা। সংক্ষেপে বলা যায়, সমালোচকের দায়িত্ব হচ্ছে 'সাহিত্যিক তথ্য' থেকে সমতুল্য 'সামাজিক তথ্যটি খুঁজে বের করা (হোসেন, ১৯৮১)। এই সূত্রটিই হচ্ছে প্লেখানভের সাহিত্যতত্ত্বের মূল কথা। বস্তুত, প্লেখানভই প্রথম সাহিত্যে সামাজিকতাবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন।

এভাবে মার্কস, গোর্কি, এঙ্গেলস, প্লেখানভ, লেনিনের হাতে সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব বিষয়টির সূচনা ঘটে।

সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের বহুমাত্রিক বিকাশ উপাদান ও সাহিত্যকর্মে প্রতিফলন

ইগলটন, ডিমিট্রভ, মাও সে-তুং, র‌্যালফ ফক্স, কডওয়েল, লুকাচ, ট্রটস্কি, লুনাচারস্কি, ফিশার প্রমুখ দার্শনিক-সাহিত্যিক-সমালোচকের লেখায় সাহিত্য সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণার বিকাশ ও বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সাধিত হয়। বস্তুত, ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তী কালেই এ-ধারণাটি ক্রমশ সমৃদ্ধ হতে থাকে। মার্কস এবং এঙ্গেলসের বিভিন্ন রচনায় সাহিত্য সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন অভিমতসমূহ সঙ্কলিত করে সে-সম্পর্কে একটি বিস্তৃত ভাষ্য উপস্থাপনাই দ্বিতীয় স্তরের অধিকাংশ দার্শনিক-সমাজবিজ্ঞানি-সাহিত্যিকের কর্মপ্রয়াসের মূল বৈশিষ্ট্য।

(ক) টেরি ইগলটন এর সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য উপাদানচিন্তা

টেরি ইগলটন মার্কসীয় সাহিত্যকে বহুমাত্রিক ভাষ্যে উপস্থাপনের মাধ্যমে সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনাধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। সাহিত্য বিশ্লেষণে তিনি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণের পক্ষপাতী।

> Marxist criticism is part of a larger body of theoretical analysis which aims to understand ideologies- the ideas, values and feelings by which men experience their societies at various times. And certain of those ideas, values and feelings are available to us only in literature (Eagleton, op. cit.. note 25).

(খ) ডিমিট্রভ এর সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য উপাদানচিন্তা

ডিমিট্রভ সমাজবিকাশের সহায়ক উপাদান হিসেবেই সাহিত্যকে বিবেচনা করেছেন। সমাজবিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে, এমন ধরনের সাহিত্যকর্ম রচনার জন্য তিনি

লেখকদের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। শিল্পমূল্যের চেয়ে সামাজিক উপযোগিতাকে তিনি সাহিত্যবিবেচনার প্রধান মাপকাঠি বলে মনে করতেন।

> Help us, help the party of the working class, the Commintern -give us a keen weapon in artistic form in poetry, novels and short-stories to use in this struggle (Dimitrov, 1968).

(গ) ট্রটস্কি'র সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য উপাদানচিন্তা

মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের মৌল প্রত্যয়কে স্বীকার করতেন, কিন্তু পাশাপাশি তিনি সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সাহিত্য কিভাবে বিপ্লব সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, সে-প্রসঙ্গে ট্রটস্কির অভিমতসমূহ গ্রথিত হয়েছে তাঁর Literature and Revolution (1925) শীর্ষক গ্রন্থে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সাহিত্যকে বিচার-বিবেচনা করেছেন। সাহিত্যের সামাজিক পটভূমির বিষয়টি বিস্তৃত হয়ে যাঁরা শুধুমাত্র এর আঙ্গিকের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে চান, ট্রটস্কি ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে। সমাজ-প্রেক্ষাপটই যে নতুন নতুন আঙ্গিকের জন্ম দেয়, এ-কথা মার্কসের মতো ট্রটস্কিও বিশ্বাস করতেন।

> বৃহৎ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যায় যে, একটি নতুন শিল্পআঙ্গিক নতুন চাহিদার প্রয়োজনে জন্মলাভ করে। ইতিহাসের বস্তুবাদী দৃষ্টিতে দেখলে সাহিত্য সবসময় ছিল সমাজের ভৃত্য ও ঐতিহাসিকভাবে উপযোগবাদী (রহমান, পাদটীকা ১৮)।

ট্রটস্কির বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে সাহিত্যের বস্তুবাদী সমাজ-নির্ভরতা ও সমাজ-উপযোগিতা-বিষয়ক মার্কসীয় মতবাদ অনেক বেশী সমৃদ্ধ ও স্পষ্টতর হয়েছে।

(ঘ) র‍্যালফ ফক্স এর সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য উপাদানচিন্তা

র‍্যালফ ফক্স মতে, সামাজিক পরিবর্তনশীলতার সূত্র যে-সাহিত্যে উপস্থাপিত হয় সেটিই হচ্ছে প্রকৃত সাহিত্য। এ-ক্ষেত্রে লেখককে তিনি বস্তুবাদী জীবনদর্শনের আলোকে সমাজের বহুমাত্রিক চিত্র তুলে ধরার প্রতি যত্নশীল হবার আহ্বান জানিয়েছেন। র‍্যালফ ফক্স মনে করেন, সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিকের মধ্যে রয়েছে একটি দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। সমাজবিকাশের ধারা সাহিত্যের বিষয়বস্তুকে নির্ধারণ করে, আর বিষয়বস্তুর মাধ্যমে নির্ধারিত হয় সাহিত্যের আঙ্গিক।

> Form is produced by content, is identical and one with it, and, though the primacy is on the side of content, form reacts on content and never remains passive (Fox, op. cit.. note 17).

(ঙ) গেওর্গ লুকাচে এর সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য উপাদানচিন্তা

গেওর্গ লুকাচে সাহিত্য আলোচনায় সমাজ-প্রবণতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। তিনি সামাজিক বাস্তবতাকে শৈল্পিক উপায়ে সাহিত্যে উপস্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন।

সাহিত্যের আঙ্গিক বিষয়ে বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ লুকাচীয় সাহিত্যতত্ত্বের উল্লেখযোগ্য দিক। তিনি মার্কসের মতই মনে করেন, সাহিত্যের চরিত্রসমূহ সামাজিক বাস্তবতার উপরই নির্ভরশীল। তাঁর ভাষায়– "..richness and profundity of created characters relies upon the richness and profundity of the total social process" (Eagleton, op. cit., note 25). তিনি মনে করেন যে, বুর্জোয়া সমাজের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট সাহিত্যকে প্রভাবিত করে।

(চ) মাও সে-তুং এর সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য উপাদানচিন্তা

মাও সে-তুং-এর দৃষ্টিভঙ্গি মার্কসীয় মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত। রাজনৈতিক সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে সাহিত্যের ভূমিকাকে তিনি সর্বদা গুরুত্ব দিতেন। তাঁর মতে, সাহিত্যিকরা সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের অন্তর্গত সম্পর্ককে আবিষ্কার করেন। কাজেই লেখককে সমাজ-সম্পর্কে উদাসীন থাকলে চলবে না। মাও সে-তুং মনে করেন– "লেখকদের সমাজ-সম্পর্কে পড়াশোনা দরকার, অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যার যার অবস্থা, তাদের চেহারা ও মনস্তত্ত্বকে অনুধাবন করা দরকার। যখন এই সব কিছু আমরা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে পারি, তখনই কেবল সমৃদ্ধ বিষয়বস্তু ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহিত্য আমরা পেতে পারি" (রহমান, পাদটীকা ১৮)। মাও সে-তুং মনে করেন, সাহিত্য হলো মানব-মস্তিষ্কে বিশেষ কোনো সমাজ-জীবনের প্রতিফলনের ফসল মাত্র।

(ছ) ক্রিস্টোফার কডওয়েল এর সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য উপাদানচিন্তা

ক্রিস্টোফার কডওয়েল মনে করেন, কোনো সাহিত্যকর্মই যথাযথভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়, যদি-না তা সমাজবিকাশ ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করে বিচার করা হয়। সামাজিক পটভূমিই বিশেষ বিশেষ সাহিত্যকর্ম সৃষ্টির পশ্চাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। কডওয়েলের মতে, বুর্জোয়া সমাজের অভ্যন্তরীণ সঙ্কটই আধুনিক কবিতা উদ্ভবের পশ্চাতে ছিল ক্রিয়াশীল।

> Modern poetry is capitalist poetry. ... All bourgeois poetry is an expression of the movement of the bourgeois illusion. According as the contradiction rooted in bourgeois economy emerge in the course of the development of Capitalism.... Poetry is then an expression of the real essence of associated men and derives its truth from this (Caudwell, op. cit.. note 12).

সমাজই যে সাহিত্যের উৎসভূমি। তিনি মনে করেন, সাহিত্যকে কিছুতেই সমাজ-সংগঠন থেকে বিছিন্ন করা সম্ভব নয়। তাঁর মতে---"... Culture cannot be separated from economic production or poetry from social organisation" (Caudwell, op. cit.. note 12). কেবল বিষয়বস্তু ও মৌল বক্তব্যই নয়, ভাষা ও রচনাশৈলীও সমাজসম্ভূত।

(জ) লুনাচারস্কি'র সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য উপাদানচিন্তা

লুনাচারস্কির মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বকে একটি সুশৃঙ্খল ও সুনির্দিষ্ট ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের সূত্র ধরেই যে সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব নামক শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে।

> মার্কসবাদী সমালোচনাশাস্ত্র অন্য সকল প্রকার সাহিত্যকর্ম থেকে প্রথমত এই কারণে পৃথক যে, এর প্রকৃতি সমাজতাত্ত্বিক না হয়ে উপায় নেই, যার ভিত্তি অবশ্যই মার্কস ও লেনিনের বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্ব (রহমান, পাদটীকা ১৮)।

লুনাচারস্কি মনে করেন, বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে যেকোনো সাহিত্যকর্মে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, সর্বদা লেখকের শ্রেণি-মনস্তত্ত্ব সাধারণত মূর্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং তাঁর মতে, একজন সমালোচককে প্রথমেই সাহিত্যে বিধৃত সমাজ-নির্যাস আবিষ্কারে যত্নশীল হতে হবে।

> মার্কসবাদী সমালোচককে অবশ্যই সাহিত্যকর্মের মধ্যে বিধৃত মূল সমাজবোধের চারিত্র্য অনুসন্ধান করতে হবে; তাঁকে অবশ্যই বের করতে হবে এর লক্ষ্যের দিকে, ঐ-প্রক্রিয়া কি নিয়মশৃঙ্খলা বিরহিত না অন্য কিছু এবং তাঁকে এই মূল সামাজিক ও গতিশীল ভিত্তির ওপর তাঁর মূল্যায়নকে দাঁড় করাতে হবে (রহমান, পাদটীকা ১৮)।

লুনাচারস্কি মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বকে বিজ্ঞান বলেও আখ্যায়িত করেছেন। বিষয়ের প্রতি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করলেও সাহিত্যের আঙ্গিক সম্পর্কেও লুনাচারস্কি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। সাহিত্যে তিনি আঙ্গিকসর্বস্বতার ঘোরতর বিরোধী। জটিল ও সারগর্ভ সমাজভাবনাকে শৈল্পিক সরলতার সঙ্গে উপস্থাপন করে লক্ষ লক্ষ পাঠককে জাগ্রত করতে পারেন যে সাহিত্যিক, লুনাচারস্কির মতে তিনিই প্রকৃত সাহিত্যিক।

(ঝ) আর্নস্ট ফিশার এর সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য উপাদানচিন্তা

আর্নস্ট ফিশার মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মনে করেন, ইন্দ্রজাল রচনা নয়, বরং পৃথিবীকে বদলানোর জন্য মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও কর্মে প্রবর্তনা যোগানোই হলো সাহিত্যের মূল কাজ। সাহিত্যকে তিনি সমাজবাস্তবতারই প্রতিফলন বলে মনে করতেন।

> Art is itself a social reality. Society needs the artist, that supreme sorcerer and it has a right to demand of him that he should be conscious of his social function" (Fischer, 1963).

এভাবে দেখা যায়, ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর থেকে উল্লিখিত সমাজ দার্শনিকগণের আলোচনা মার্কসীয় সমাজশাস্ত্রকে বহুমাত্রিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পূর্ণতা প্রদান করেন।

সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের চূড়ান্ত বিকাশ ধারার নতুন উপাদান ও সাহিত্যকর্মে প্রতিফলন

১৯২৩ এর পর থেকে এই পর্বের সমাজতাত্ত্বিকগণ সম্পূর্ণ মার্কসীয় নয়, কেবল মার্কসের কোনো কোনো বিক্ষিপ্ত চিন্তাকে কাজে লাগিয়েছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন– থিয়োডর এডরনো, ওয়ালটার বেঞ্জামিন, হার্বার্ট মার্কিউস, রেমন্ড উইলিয়াম্‌স প্রমুখ। এঁদেরই সমকালে লুসিয়ান গোল্ডম্যান ও জ্যাঁ পল সার্তে সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষণে মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর রাখেন।

(ক) জ্যাঁ পল সার্তে এর সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য উপাদানচিন্তা

জ্যাঁ পল সার্তে সাহিত্যকে মার্কসীয় মতবাদ ও তাঁর নিজস্ব চিন্তা অস্তিত্ববাদী দর্শনের সমন্বয়ে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। তিনি সমাজ-মনস্তত্ত্বের চেয়ে মানব-মনস্তত্ত্বকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তাঁর সাহিত্যেও দেখা যায় সমাজ স্রোতে ভাসমান মানুষের অভ্যন্তরীণ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রয়াস। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ নয়, বরং একক মানুষের অস্তিত্ব-সঙ্কটের পটভূমি বিন্যাস করে তিনি বিশেষ কোনো সাহিত্যিক-চরিত্রকে দেখতে চেয়েছেন। তাঁর এই চিন্তা সাহিত্যের সমাজতত্ত্বে স্বতন্ত্র মাত্রা এনেছে।

(খ) রেমন্ড উইলিয়াম্‌স এর সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য উপাদানচিন্তা

রেমন্ড উইলিয়াম্‌স সাহিত্যচিন্তায় মার্কসীয় বস্তুবাদী ধারণার সৃজনশীল প্রকাশ সন্ধান করেছেন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী চিন্তা প্রত্যক্ষভাবে নয়, বরং সৃষ্টিশীল উপায়ে সাহিত্যে প্রতিফলিত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। নব্য-মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সাহিত্যের মৌলসত্তাকে বিবেচনা করেছেন।

> Literary production, then is creative not in the ideological sense of the new vision, which takes a small part for the whole, but in the material social sense of a specific practice of self-making (Williams, 1977).

(গ) ওয়ালটার বেঞ্জামিন এর সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য উপাদানচিন্তা

ওয়ালটার বেঞ্জামিন সাহিত্যে সমাজচিত্রের সরাসরি উপস্থিতির পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি রূপক-প্রতীকের মাধ্যমে শৈল্পিক আবরণে সমাজবাস্তবতা উন্মোচনের কথা বলেছেন। বেঞ্জামিন রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ককে গভীর গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন; তবে 'Communist Politization of art' তিনি সমর্থন করতে পারেননি (Jameson, 1974).

(ঘ) লুসিয়ান গোল্ডম্যান এর সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য উপাদানচিন্তা

লুসিয়ান গোল্ডম্যান সাহিত্যকর্মের কাঠামো পরীক্ষার মাধ্যমে কোনো বিশেষ সামাজিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত লেখকের চিন্তার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। তাঁর মতে, লেখার মধ্য দিয়ে যত স্পষ্ট ভাবে সামাজিকশ্রেণির বিশ্ববীক্ষা প্রকাশিত হবে, শিল্পকর্ম হিসেবে ততই তা সার্থক। তিনি সাহিত্যকর্মকে ব্যক্তি-চরিত্রের সৃষ্টি হিসেবে দেখেন না, বরং তিনি একটি সামাজিক গোষ্ঠীর

'ব্যক্তি-উর্দ্ধ মানসিক কাঠামোর সৃষ্টি হিসেবে তাকে বিবেচনা করেন– যার দ্বারা তিনি সেই শ্রেণি-গোষ্ঠীর ভাবনা, মূল্যবোধ ও আকাঙ্ক্ষার কাঠামোকে বোঝাতে চান।

> ...the structure of the world of work is homologous with the mental structure of certain social group or is in intelligible relation with them (Goldmann, 1978).

(ঙ) থিয়োডর এডরনো এর সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য উপাদানচিন্তা

থিয়োডর এডরনো তিনি সাহিত্যকে বাহ্যিক উপাদানের মধ্যে সন্ধান না করে সমাজের দ্বান্দ্বিক নিয়ম ও অবস্থানের মাঝে খুঁজতে চেয়েছেন। লেখকের দায়বদ্ধতার প্রতিও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন।

> ...in the realm of literary criticism the Sociological approach necessarily juxtaposes the individual work of art with some vaster form of social reality which is seen in one way or another as its Source or ontological ground (Jameson, 1974).

(চ) হার্বার্ট মার্কিউস এর সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য উপাদানচিন্তা

হার্বার্ট মার্কিউস তিনি সাহিত্যকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার বিরোধিতা করেছেন। তবে তিনি সমাজ ও রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ককে স্বীকার করেন। তিনি সমাজ ও রাজনৈতিক বিকাশধারা নান্দনিক উপায়ে সাহিত্যে উপস্থাপন করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলেন– "The Political potential of art lies only in its aesthetic dimension" (Marcuse, 1979). তাঁর মতে, শিল্প তার নান্দনিক রূপের ভিত্তিতেই স্বয়ম্ভূ। খাঁটি শিল্প সব সময়ই বিপ্লবী, যা বাস্তবতার আলোকে মানুষকে মুক্তির পথ দেখায় (ইসলাম, পাদটীকা ২৭)।

(ছ) অতি সমকালীন সমাজতাত্ত্বিকদের সাহিত্য উপাদানচিন্তা

অতি সমকালীন সমাজতাত্ত্বিকরা মার্কস, মার্কসীয় মতাবলম্বী এবং নব্য-মার্কসীয় বিতর্কে না গিয়ে সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব ব্যাখ্যায় তাঁরা সমাজ জীবনের বহুমাত্রিক চিত্র উপস্থাপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এঁরা মৌল-কাঠামো, উপরি-কাঠামো, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, বিষয় ও প্রকরণের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি জটিলতার পরিবর্তে সাহিত্যে সমাজচিত্রের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির আলোকে সাহিত্যের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন, লুইস এ. কোজার। তাঁর দৃষ্টিতে সাহিত্য হচ্ছে সামাজিক বাস্তবতার প্রামাণ্য চিত্র।

> Literature though it may also be many other things, is social evidence and testimony. It is a continious commentary on manners and morals (Coser, op. cit., note 26).

সুতরাং সমাজব্যবস্থার মৌল বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের জন্য তিনি সমাজবিজ্ঞানিকে সাহিত্যের প্রতি মনোযোগী হবার আহ্বান জানিয়েছেন।

> The literary creator has the ability to identify with wide ranges of experience, and he has the trained capacity to articulate through his fantasy the existential problems of his contemporaries. Why then should not sociology harness to its use, for the understanding of man and his society, those untapped sources in the rich accumulation of literature?" (Coser, op. cit., note 26).

এভাবে দেখা যায়, বিংশ শতাব্দির শেষ করে একবিংশ শতকেও সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে এর নানা উপাদান বিশ্বসাহিত্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।

উপসংহার

সাহিত্যকর্মের সমাজতাত্ত্বিক উপাদান পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা এবং তার মধ্য থেকে সমাজবিজ্ঞানিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উপাদানসমূহ উদ্ধার করা সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের মূল কাজ। একটি বিশেষ সমাজের সামাজিক ইতিহাস, উৎপাদন ব্যবস্থা, লেখক ও পাঠকদের সামাজিক অবস্থান, সামাজিক স্তরবিন্যাস, সমাজের বহুমাত্রিক চিত্র কিভাবে বিশেষ কোনো সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত হলো, তা খুঁজে বের করাই সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব নামক জ্ঞানের এই শাখাটির প্রধান লক্ষ্য।

> সত্যিকারের সাহিত্যিককে মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র না এঁকে নিম্নশ্রেণীর চিত্র আঁকতে হবে তা হলেই সাহিত্যিক সমাজ সচেতন হলেন। তা মোটেই নয়। সমাজ সচেতনতার অর্থ সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। যে সাহিত্য মানুষকে, ঘটনাকে, জীবনজিজ্ঞাসাকে সমাজ বিবর্তন ও সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখার চেষ্টা করেছে, তাই হল প্রকৃত সাহিত্য (করিম, ১৯৮৪)।

কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানি অবশ্য সাহিত্য ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ককেই বৃহত্তর অর্থে সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন। গোল্ডম্যান বৃহত্তর অর্থে সাহিত্যের সমাজতত্ত্বকে সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস কীভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের সেটাই মুখ্য বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বস্তুত, সমাজবিবর্তনের ইতিহাস যদি সামান্য মাত্রায়ও কোনো সাহিত্যকর্মে বিধৃত থাকে, কেবল তাহলেই সমাজবিজ্ঞানির কাছে ঐ সাহিত্যকর্ম তাৎপর্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয় হতে পারে। সামাজিক বিবর্তন ও শ্রেণিবিন্যাস-নির্দেশক যেকোনো সাহিতকর্ম সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে। সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে যে সাহিত্যিক সচেতন নন, যাঁর লেখায় নেই সমাজবিকাশের কোনো নির্ভরযোগ্য বিবরণ, সমাজবিজ্ঞানির কাছে সে-সাহিত্য গুরুত্বহীন।

একটি বিশেষ সমাজব্যবস্থা থেকে কি ধরনের সাহিত্যকর্ম কিভাবে উদ্ভূত হয়, তা সাহিত্যের সমাজতত্ত্বে ব্যাখ্যা করা হয়। সমাজব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো অনুধাবনের জন্যই সমাজবিজ্ঞানি সাহিত্য-পাঠে উদ্বুদ্ধ হন।

'সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব' তাই বিশেষ কোনো সাহিত্যকর্মের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমির প্রতিই সমধিক গুরুত্ব দেয়, সাহিত্যের নান্দনিক মূল্য এখানে গৌণ বিষয়। সমাজবিজ্ঞানি সাহিত্যের উৎসের বস্তুভিত্তিক ব্যাখ্যা দেন, সমাজকাঠামোর সঙ্গে সাহিত্যের আন্তঃসম্পর্ক নির্ধারণ করেন এবং সমাজজীবনে সংশ্লিষ্ট সাহিত্যকর্মের প্রভাবের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন। অপরদিকে, সাহিত্য সমালোচকের দায়িত্ব হচ্ছে সাহিত্যের নান্দনিক মূল্য নিরূপণ ও ব্যাখ্যা প্রদান। তবে সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে এই দ্বৈতধারার মধ্যে প্রায়ই বিভ্রম দেখা দেয়। সমাজতাত্ত্বিক ও নান্দনিক বিচার কখনো কখনো অভিন্ন হয়ে যায়।

সমাজসম্পৃক্তি সাহিত্যসৃষ্টির অনিবার্য শর্ত। সমাজের বিবর্তন প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে, সুতরাং সাহিত্য থেকে সমাজ-ইতিহাসের রূপ-রূপান্তর আবিষ্কার করা সমাজতত্ত্বের অন্যতম কাজ। সাহিত্য ও সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সমাজতাত্ত্বিকের নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তটি লক্ষণীয়– "The first and the most significant reason for the relationship between society and literature, is the fact that man creates the literature and he is a social animal" (Fischer, 1963)। সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আবিষ্কারই সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের প্রধান কাজ।

তথ্যপঞ্জি

১. ইসলাম, আ. (১৯৯১)। *সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব : প্রাথমিক ভাবনা*। ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।
২. উমর, ব. (১৯৮৬)। *মার্কসীয় দর্শন ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশনী।
৩. করিম, এ. ক. ন. (১৯৮৪)। *সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞান*। ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৪. গুহ, প. (১৯৭৫)। *মার্কসীয় সাহিত্য সমালোচনার সমস্যা*। কলকাতা: চলতি দুনিয়া প্রকাশী।
৫. গোর্কি, ম. (১৯৮১)। *মা*। মস্কো: প্রগতি প্রকাশন।
৬. চক্রবর্তী, স. (১৯৮৩)। *মার্কসীয় চেতনা ও বাংলা কাব্যের প্রগতিশীল ধারা*। কলকাতা: উচ্চারণ।
৭. চট্টোপাধ্যায়, স. (১৯৮৪)। *মার্কসবাদ ও নন্দনতত্ত্ব*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।
৮. চৌধুরী, আ. ক. (১৯৮২)। *বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নকশা: পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।
৯. দাস, শ. (১৯৭৬)। *সাহিত্য- সন্দর্শন*। কলকাতা: চক্রবর্তী-চাটার্জী অ্যান্ড কোং।
১০. পোদ্দার, অ. (১৯৮৫)। *মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যবিচার*। কলকাতা: উচ্চারণ।
১১. মাহমুদ, অ. (১৯৯৫)। *আধুনিক বাংলা কাব্যে সাম্যবাদী চেতনা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।
১২. মোকাম্মেল, ত. (১৯৮৯)। *মার্কসবাদ ও সাহিত্য*। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।
১৩. রহমান, স. (১৯৮৫)। *মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা*। ঢাকা: একাডেমিক পাবলিশার্স।
১৪. হোসেন, শ. (১৯৮১)। *মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচনা ও শেক্সপিয়ার*। ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা (ত্রয়োদশ সংখ্যা)।
১৫. Arvon, H. (1973). *Marxist Esthetics*. Cornell: Cornell University.
১৬. Biswas, D. K. (1974). *Sociology of Major Bengali Novels*. Haryana:The Academic Press.
১৭. Bottomore, T. (1988). *A Dictionary of Marxist Thought*. Oxford: Blackwell Reference.
১৮. Burke, K. (1973). *Literature as Equipment of living.* London: Penguin Book.
১৯. Caudwell, C. (1947). *Illusion and Reality*. Bombay: People's publishing House.
২০. Coser, L. A. (1963). *Sociology Through Literature.* London: Prentic – Hall.
২১. Daiches, D. (1938). *Literature and Society.* London: Lawrence and Wishart.
২২. Dimitrov, J. (1968). *Complete Works, vol. 1.* Moscow: Progress publishers.
২৩. Eagleton, T. (1976). *Marxism And Literary Criticism*. London: Methuen and Co. Ltd.
২৪. Engels, M. (1976). *On Literature and Art.* Moscow: Progress Publishers.
২৫. Fischer, E. (1963). *The Necessity of Art*. London: Penguin Book.
২৬. Fox, R. (1937). *The Novel and the People.* London: Lawrence and Wishart.
২৭. Goldmann, L. (1967). *The Sociology of Literature-Status and problems of Method*. London: International Social Sciences Journal, Vol. XIX.
২৮. Goldmann, L. (1978). *Towards a Sociology of the Novel.* London:Tavistock Paper Backs.
২৯. Jameson, F. (1974). *Marxism and Form*. Princeton: Princeton University press.
৩০. Lenin, V. I. (1970). *On Literature and Art.* Moscow: Progress Publishers.
৩১. Plekhanov, G. V. (1974) *Art and Social life.* Progress Publishers, Moscow.
৩২. Stark, W. (1958). *The Sociology of Knowledge*. London: Poutledge Kegan Paul.
৩৩. Williams, R. (1977). *Marxism and Literature*. London: OUP.